দ্য বেঙ্গল কেমিস্ট্রি

বাংলাদেশের ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র-পররাষ্ট্র ও গণতন্ত্র

ইত্যাদির উপর লিখিত সুচিন্তিত, সুগভীর ও সুপাঠ্য প্রবন্ধসমূহ।

MCB The Mega City Books

THE BENGAL CHEMISTRY

Authored by Md. Mossiur Rahman Touhid

144 Pages , 5.5" x 8.5"

Black & White on White paper

ISBN-13: 9781540639363

ISBN-10: 1540639363

Dear readers,

"This book is regarding various issues of Bangladesh's Politics, History, Democracy and Diplomacy .

I recommend that you read this book from the beginning to end as per articles of the book are arranged considering psychological aspect of readers.

1 **Personal opinion** on various issues related to the politics of Bangladesh has been expressed freely, boldly and impartially as much as possible.

2 **All issues of the book** have been picked up from various media of Bangladesh whenever highlighted in news and in talk shows.

3 **Opinions that have been expressed** in this book are remarkably different than those are commonly and widely discussed in Bangladesh, therefore no reference has been given.

Please note down if any question arises in your mind during the time of reading and feel free to forward me for further elaboration. I'll take the appropriate move after discussing with you.

Next books of this kind would be written if readers of this book approve my opinions and give me green signal to continue."

-**The Author**

দ্য বেঙ্গল কেমিস্ট্রি

মো: মশিউর রহমান তৌহিদ

The Mega City Books

বানান, ভাষারীতি, এডিটিং, ডিজাইন এবং প্রকাশ - মোঃ মশিউর রহমান তৌহিদ

যোগাযোগ- thebengalchemistry@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৭

তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০১৯

তৃতীয় সংস্করণ: মে ২০২০

[মোঃ মশিউর রহমান তৌহিদ কর্তৃক বইটির সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য- টাকা মাত্র।

THE BENGAL CHEMISTRY

"This book is regarding various issues of Bangladesh's Politics, History, Democracy and Diplomacy.

Authored by Md Mossiur Rahman Touhid

1st Published in March 2016.

Published by **The Mega City Books**

উৎসর্গ

আমার সদ্য(১৭/১১/২০২০) প্রয়াত আম্মা কামরুন নাহার রহমানকে

এবং আমার অকালে পরলোকগত আব্বা

জনাব মোঃ আবদুর রহমানকে।

১৯৭৬ সালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে

অসুস্থতার ঘোরে আমার আব্বা বলেছিলেন,

“শেখ মুজিব যদি আগে জানতে পারতেন যে,

এদেশের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা এবং

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এত চোর

তাহলে তিনি এত তাড়াতাড়ি এদেশ স্বাধীন করতেন না।”

এটিই ছিল আমার শোনা আব্বার মুখে বলা শেষ কথা।

তার বেশ কয়েকদিন আগে আমার আব্বাকে বলতে শুনেছিলাম

“১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন করার জন্য সঠিক সময় ছিল না।

কারণ একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনা করার দক্ষতা এদেশের কারো নেই।

স্বাধীনতার জন্য আরও অপেক্ষা করা উচিত ছিল।”

আমি আজও সেই কথা ভুলিনি।

বাস্তবতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি।

লেখকের কথা

সাবেক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে আমি শুরু থেকেই একজন রাজনীতিবিদ। রাষ্ট্র-রাজনীতি-পররাষ্ট্রনীতি-উন্নয়ননীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমার চিন্তাধারায় বেশি প্রাধান্য পায়। নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলে- আমার মাতাপিতা এবং তাদের পূর্ব পুরুষেরা বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুরের পদ্মা নদী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের। তবে আমার জন্ম হয়েছিল করাচীতে। বর্তমান নিবাস ঢাকায়। একনাগাড়ে সাত বছর ছিলাম কোলকাতায়। ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৭ সাল থেকে আমি কোলকাতা থেকে খুব ঘন ঘন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাওয়া-আসা করতে শুরু করেছিলাম। আবার যেখানেই যেতাম আমার মন যেন সব সময় কোলকাতায় পড়ে থাকতো। মনে হত কি যেন বোঝার বা জানার বাকি রয়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে কি আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনেকখানি গভীর হয় ঢাকা থেকে কোলকাতা যাওয়ার পর। যদিও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এর শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি থেকে। যখন সেসময়কার বিরোধী দলীয় নেত্রী হাসিনার ঢাকার মিন্টু রোডের বাসভবনে জার্মানী থেকে আসা সাংবাদিকদের সাথে আমার পরিচয় হয়। ঐসময় বিভিন্ন জাতিয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিশেষ করে ফারাক্কা, তালপট্টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে পক্ষ বিপক্ষের রাজনৈতিক মত আমাকে গভীর ভাবনায় ফেলে দেয়। কারো

মতামত আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিলো না। যদিও ওসব বিষয়গুলোতে আমার নিজের মতামত সেসময় তেমন জোরালো ছিল না। কিন্তু কোলকাতায় যাওয়ার পর থেকে আমার মনে ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর আমার নিজের স্পষ্ট মতামত। ভারতের রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং সামরিকনীতির উপর আমার পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের বিবেচনায়। তারপর কোলকাতা হয়ে ইউরোপে আরও ছয় বছর কাটিয়ে ২০০৬ সালে ঢাকায় ফিরে এসে বুঝলাম যে, আমি আর সেই আমিতে নেই। ঢাকা আর ঢাকার মানুষদের সাথে আমার বিস্তর ফারাক তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় কারো সাথেই আমার চিন্তা-ধারার মিল হচ্ছে না। রাজনীতিতে আমার জন্য যেন কোন জায়গা নেই। আমার, আমার মা-বাবা এবং আমার পূর্বপুরুষদের ভালোবাসার এই দেশে আমি যেন এক অচেনা পরবাসী। তখন ভাবলাম, আমি কী একেবারে হারিয়ে যাবো? তার চাইতে কিছু লিখলে কেমন হয়? তারপর থেকে একটু একটু করে লিখে যাচ্ছি। বিভিন্ন বিষয়গুলোতে নিজের মতামত। এতদিন এদেশের মানুষদেরকে যা বলা হয়েছিল, যা জানানো হয়েছিল এবং যা বোঝানো হয়েছিল আমার মতামতগুলো তা থেকে অনেকখানি ভিন্ন মতের। এভিন্ন মতের বিষয়টি এমন পর্যায়ের যা গত একশত বছরের এদেশের রাজনীতিবিদদের এবং বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারাকে অনেকখানি ভ্রান্ত বলে প্রমাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাতীয় স্বার্থ প্রশ্নে সতর্ক এবং সুবিবেচক হতে সজাগ করবে।

ঢাকা ১০ই মার্চ ২০১৬।

দ্য বেঙ্গল কেমিস্ট্রি

পাঠকদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ রইলো বইটি

প্রথম প্রবন্ধটি থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে পড়ার জন্য।

* দ্য বেঙ্গল কেমিস্ট্রি

সুবিশাল এবং সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি কেমিস্ট্রি বিদ্যমান আছে। এই কেমিস্ট্রির কারণে আজকের বাংলাদেশের বেশির ভাগ ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। সুদূর প্রাচীনকালে যখন থেকে দুটি বিশাল ভূখণ্ডের মুখোমুখি সংঘর্ষে হিমালয় পর্বতমালা তৈরি হয় তখন থেকে এই বিশেষ কেমিস্ট্রির যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই কেমিস্ট্রি হচ্ছে সমুদ্র এবং হিমালয়ের মধ্যে বিদ্যমান একটি বিশেষ দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক- যা এই উর্বর ভূখণ্ডের উতপত্তিসহ এই দেশের বিশেষ আবহাওয়া এবং উদ্ভিদসহ সমস্ত জীব বৈচিত্র্যের একমাত্র রহস্য। আপাতদৃষ্টিতে এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক হচ্ছে সমুদ্র থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মেঘমালা হিমালয়ের দিকে ধাবিত হওয়া এবং তারপরে ঐ মেঘমালা থেকে পরিবর্তিত পানি স্রোত হয়ে নদ-নদী দিয়ে হিমালয় থেকে সমুদ্রে ফিরে আসা। পানির এই আকাশপথে হিমালয়ের দিকে ধাবিত হওয়া এবং নদীপথে ফিরে আসার কারণ হচ্ছে উভয় ডেসটিনেশনে বিশেষ বিশেষ ধরনের ডিমান্ড তৈরি হওয়া। হিমালয় এবং সমুদ্রের এই বিশেষ ডিমান্ড নিয়ে গবেষণা হলে পৃথিবীর জলবায়ু সম্পর্কিত অনেক রহস্য যেমন বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু উতঘাটন হতে পারে। এমনকী পৃথিবীর বিভিন্ন মরুভূমিতেও আগের কোন এক কালের মত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, সমুদ্র কী চায় হিমালয়ের কাছে, সেই শুরু থেকে? কেন বঙ্গোপসাগর থেকে পানি জলীয়বাষ্প পূর্ণ মেঘমালা হয়ে হিমালয় পর্যন্ত গিয়ে হিমালয়কে এবং হিমালয় ও সমুদ্রের মধ্যস্থিত স্থলভূমিকে ধুয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে আসে? নিশ্চয় এমন এক বা একাধিক উপাদানের জন্য যা সমুদ্রের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। একসময় হিমালয় পর্বতমালা নিশ্চয় সমুদ্রের অংশ ছিল এবং সমুদ্র থেকে বেরিয়ে যাবার কারণে স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রে একটি শূন্যতা বা ঘাটতির সৃষ্টি হয়। আবার যেহেতু হিমালয় পর্বতমালা এখন সমুদ্রের অংশ নয় সেহেতু হিমালয় পর্বতমালার গায়ে বা পরতে পরতে লেগে থাকা কতক উপাদানগুলো বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয়। সমুদ্র ফিরে পেতে চায় তার দরকারি নিজ উপাদানগুলো আর হিমালয় ঝেড়ে ফেলতে বা ধুয়ে ফেলতে চায় তার গায়ে লেগে থাকা অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো। এই কারণে উভয় জায়গায় বিশেষ বিশেষ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই চাহিদার কারণে পানির আকাশপথে সমুদ্র থেকে হিমালয়ের দিকে যাওয়ার এবং হিমালয় থেকে নদীপথে সমুদ্রে ফিরে আসার মধ্যে প্রকৃতির একটি আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। আকাশপথে একই ধরনের জলীয় বাষ্প হিমালয়ের দিকে ধাবিত হলেও হিমালয় থেকে সমুদ্রে ফিরে আসা পানি ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান নিয়ে ফিরে আসে। এই কারণে হিমালয় থেকে আসা সিন্ধু, গঙ্গা, এবং ব্রহ্মপুত্র নদীগুলোর পানি একরকম নয়। বিশেষকরে বেঙ্গল কনকেভ পয়েন্টের বা মেঘনা নদীর মোহনার দিকে ধাবিত হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আসা গঙ্গা-পদ্মা এবং হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে আসা ব্রহ্মপুত্র-যমুনার ও ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার পানির মধ্যে এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। আবার প্রকৃতির বিশেষ প্রয়োজনে এই দুটি ধারার পানি এক বা একাধিক পয়েন্টে পরস্পরে মিশ্রিত হয়ে তারপর মেঘনা নদীর মোহনা কেন্দ্রিক বেঙ্গল কনকেভ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। সেই সাথে প্রকৃতির বিশেষ প্রয়োজনে পরস্পরে

মিশ্রিত হওয়ার জন্যই এই দুটি ধারার পানির নদীগুলো হিমালয়ের দু-প্রান্তে উতপত্তি হয়েও এদের গতিপথ একে অন্যের দিকে অনেক পথ অতিক্রম করে বেঁকে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু ঐনদীগুলোর উপর ফারাক্কা ব্যারাজ সহ বিভিন্ন বাঁধ বা ব্যারাজ নির্মাণ করার ফলে প্রকৃতির এই অতি জরুরী স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে এবং পুরাপুরি ব্যাহত হতে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। কাজেই ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণ করাটি হচ্ছে পৃথিবীতে এই যাবতকালের পরিবেশের বিরুদ্ধে যতগুলো বৃহত আকারের ক্রাইম হয়েছে তারমধ্যে সর্বকালের সবচেয়ে বড় ক্রাইম। যা শুধু হিমালয় এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থিত ভূমির ক্ষতি করছে না, হিমালয় এবং বঙ্গোপসাগরেরও সীমাহীন ক্ষতি করে যাচ্ছে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে। গত পাঁচ হাজার বছর বা তারও অধিক সময় ধরে উপর উল্লেখিত ডিমান্ডের কারণে হিমালয় ও হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় যেই পরিমাণ ভূমিক্ষয় হয়েছে এবং যেই পরিমাণ ডিপোজিশান বেঙ্গল কনকেভ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে তার সমপরিমাণ কিংবা তার কাছাকাছি কিংবা তার চাইতে বেশি পরিমাণ ভূমিক্ষয় হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে হিমালয় এবং হিমালয় সংলগ্ন এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকহারে ডি-ফরেষ্টেশানের কারণে। কিন্তু সেই পরিমাণ ডিপোজিশানগুলো ফারাক্কা ব্যারেজ সহ উজানে বিভিন্ন বাঁধ ব্যারেজ নির্মাণের কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বেঙ্গল কনকেভ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যেতে না পারায় সাগর সহ সামগ্রিক পরিবেশের যেক্ষতি হয়েছে তা এই পৃথিবীতে অন্য যেকোনো পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষতির তুলনায় অনেক বড়। আসলে ভারত তৈরি ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবেশের যেক্ষতি হয়েছে এবং যেক্ষতি হয়ে আসছে তা সীমাহীন। গত পঞ্চাশ বছরের উপরোল্লিখিত ভূমিক্ষয়ের ডিপোজিশানগুলো এদেশে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আসতে না পারার কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির স্বাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। ব্যাহত হয়েছে তীরবর্তী সমুদ্র অঞ্চল থেকে মহী-সোপান পর্যন্ত সমুদ্রতলের ভূমি গঠন সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া। আবার যেই উপাদানগুলো বঙ্গোপসাগরের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের জন্য অতিজরুরী তা ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বেঙ্গল কনকেভ দিয়ে সমুদ্রে আসতে না পারার কারণে সমুদ্রের প্রয়োজনে সমুদ্রের দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীগুলোর তীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া চলছে জোরেশোরে। এমনকী কোন কোন বছর শীতকালেও এই রকম নদী-ভাঙন হতে দেখা যায়। এতে গত পঞ্চাশ বছরে মানবিক বিপর্যয় সহ বাংলাদেশের যেসামগ্রিক ক্ষতি হয়েছে এবং হয়ে আসছে তা নির্ণয় করা পৃথিবীর কোন ক্যালকুলেটর দিয়ে সম্ভব নয়। এই ক্ষতিটি আজ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনায় কিংবা কোন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন আলোচনায় তুলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কোন পদক্ষেপ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোন কালেই নেওয়া হয়নি। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সমুদ্র দাবীর পক্ষে জাতিসংঘের সমুদ্র আদালতে যেভলিউমের পর ভলিউমগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে হিমালয় থেকে বেঙ্গল কনকেভ এবং বেঙ্গল কনকেভ থেকে বেঙ্গল ফ্যানসহ বঙ্গোপসাগরের শেষসীমা পর্যন্ত অনেক কিছু মুখস্থ বিদ্যার মত বর্ণনা করা হলেও সূক্ষ্ম কারচুপির মত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বেঙ্গল কেমিস্ট্রিসহ ফারাক্কার মত মহা-গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো। অথচ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে এই বেঙ্গল কেমিস্ট্রি ও ফারাক্কা ব্যারাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক

সমুদ্র আদালতে উপস্থাপন করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষের সমস্ত যুক্তিগুলোর মুল ভিত্তি। বিশেষ করে ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে বাংলাদেশের যে সামগ্রিক পরিবেশ ক্ষতি হয়েছে সেটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উপস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু বেঙ্গল কেমিস্ট্রি ও ফারাক্কা ব্যারাজ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়নি সেহেতু সমুদ্র আদালতের রায়ে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশকে বিশেষ কতগুলো ক্ষতির মেনে নিতে হয়েছে। এতে বাংলাদেশ শুধু "দক্ষিণ তালপট্টি" সমুদ্র অঞ্চল এবং দ্বীপ হারায়নি বরং এর উপর ভিত্তি করা অনেকটুকু সমুদ্র অঞ্চল হারিয়েছে। আগস্ট ২০১৪।

* সমুদ্র আদালতে বাংলাদেশে এবং কিছু সোজা কথা

যেভাবে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পরিচালনা করেছিলো তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে দক্ষিণ তালপট্টি এরিয়া ভারতকে হস্তান্তর করেছে। বা ভারত যাতে উক্ত এরিয়া পেয়ে যায় ঠিক সেভাবে কাজ করেছে। তা না হলে সরকার এই ধরনের একটি মহাগুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে খুব উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতেন। সেই সাথে কোন কিছু গোপন না রেখে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের আইনি লড়াইয়ে আমাদের ন্যায্য দাবী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলো জনসম্মুখে আলোচনায় নিয়ে আসতেন। তাহলে সরকারের স্ট্রাটেজি সঠিক না হলে সঠিক সাজেশন দেওয়া যেত। তবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে এদেশের কারো কোন জ্ঞান নেই, সরকারের এদাবী বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যমুলকভাবে সমস্ত কিছু গোপন রেখে যেভাবে সমস্ত কিছু ডিল করা হয়েছে তাতে শুধু ভারত লাভবান হয়েছে। কারণ যা এদেশের মানুষদের কাছে গোপন রাখা হয় তার কোন কিছু ভারতের কাছে কোন দিন গোপন থাকে না। যারা এদেশের মানুষদের কাছে যা গোপন রাখে তারাই বা তাদের কেহ ভারতের কাছে তা প্রকাশ করে দেয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের মাধ্যমে ভারতকে তালপট্টি দ্বীপ দিয়ে দেওয়ার পর যেভাবে সরকারের বিভিন্ন জন সাফাই গেয়ে যাচ্ছিল তাতে অনেক প্রশ্ন উঠে আসে স্বাভাবিক কারণে। তাহলে কী "জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার" সার্ভে ভুল, ভারত সরকারের সব মাপ-যোগ ভুল, ভুল ভারতের মিলিটারি সার্ভের? যেখানে কোথাও বলা হয়নি যে, ঐটি দ্বীপ নয়, ঐটি শুধুই এলুভিয়াল ল্যান্ড। যেখানে কোথাও বলা হয়নি যে, ঐটি শুধু ভারতের, বাংলাদেশের নয়। যে কথাটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ঐদ্বীপের জন্য নাকি ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, আবার নাকি ভারত বিভক্তি ঘটতে পারে। এরজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঐকথিত যথাযথ ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি স্ট্রাটেজি ঠিক করা হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, ভারতকে ঐসব ষ্ট্রাটেজির কোন কিছুই ব্যবহার করতে হয়নি কষ্ট করে নিজের স্বার্থে। খুব সহজে বাংলাদেশে ভারতের তাবেদার সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জায়গা আজ ভারতের চির-দখলে চলে গিয়েছে। যদিও ঐসব ষ্ট্রাটেজিগুলো ঠিক করা হয়েছিল দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপকে বাংলাদেশের দ্বীপ হিসেবে ধরে নিয়েই। অথচ যেকোনো আন্তর্জাতিক আদালতে এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে বাংলাদেশের

সবচেয়ে জোরালো দাবী হওয়া উচিত ছিল আন্দামান-নিকবর দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা দাবী করা। কারণ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির সময় ঐদ্বীপপুঞ্জ ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আওতাভুক্ত নোম্যান ল্যান্ডস। আর নোম্যান ল্যান্ডস ছিল বলেই ঐদ্বীপপুঞ্জে সেসময় কোন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে বাংলা বিভক্তিকরণ ম্যান্ডেট দ্বারা কিংবা অন্যভাবে ঐদ্বীপপুঞ্জের বিভক্তি কিংবা মালিকানা আজও নির্ধারিত হয়নি, যেভাবে সুন্দরবনের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছিল। সেকারণে ঐদ্বীপপুঞ্জের একচেটিয়া অধিকার শুধু ভারতের নয় বাংলাদেশেরও। এসংক্রান্ত বিষয়ে অতীতের আন্তর্জাতিক আদালতে যত রায় হয়েছে সে অনুসারে সবকিছুই বাংলাদেশের দাবীর পক্ষে ছিল এবং এখনও আছে। তবে এজন্য বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই আন্দামান-নিকবরে বসবাসকারী আদিম অধিবাসীদের মত একদম উলঙ্গ না থেকে অন্তত কিছু একটা গায়ে চাপানো খুব দরকার ছিল। আসলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাইতে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা ছিল অনেক সহজ। তার কারণ হল, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে নাফ নদীর অবস্থান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে হাড়িভাংগা নদীর অবস্থান। মিয়ানমারের সাথে সীমানায় অবস্থিত নাফ নদীর বঙ্গোপসাগর মোহানায় সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্ত হিসেব-নিকেশ এবং ভারতের সাথে সীমানায় অবস্থিত হাড়িভাংগা নদীর বঙ্গোপসাগর মোহানায় সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্ত হিসেব নিকেশ প্রায় একই রকম। কিন্তু সেই হিসেব-নিকেশ ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় আমরা যেমন মিয়ানমারের সাথে অনেক জায়গা হারিয়েছি ঠিক তেমনি ভারতের সাথে আমরা হারিয়েছি দক্ষিণ তালপট্টির মত আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সমুদ্র এরিয়া। এজায়গা হারানোর বিষয়টির সমস্ত দায়দায়িত্ব বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের। কারণ মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র-সীমা নির্ধারণে নাফ নদীর সঠিক হিসেব শক্তভাবে আন্তর্জাতিক সমুদ্র-আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি দৃশ্যত ভারতের গোপন হস্তক্ষেপে। সেইসাথে ভারতের গোপন মধ্যস্থতার ফল হচ্ছে মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র জায়গা হারিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের মাধ্যমে আমাদের কথিত সমুদ্র বিজয়। যা ভারতের জন্য আমাদের দক্ষিণ তালপট্টি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিশাল সাফল্য হিসাবে কাজ করেছে। যেহেতু আমাদের সরকার মিয়ানমারের সাথে কথিত সমুদ্র বিজয় নিয়ে মিথ্যে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকার ভান করেছিল। সেঅনুযায়ী ইচ্ছাকৃত-ভাবে খুবই ডাস্টবিন কোয়ালিটির ব্যক্তিবর্গ দিয়ে আবারও একই কায়দায় ভারতের সাথে আমাদের দাবী আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে উপস্থাপন করে ভারতকে আমাদের দক্ষিণ তালপট্টি বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে, ১৯৮২ সালের আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন প্রণয়নের পর ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কিছু লোক এবং কিছু কট্টর মৌলবাদী লোক বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে বই লিখে এবং চিঠি লিখে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল যাতে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপসহ উক্ত এরিয়া অবিলম্বে জোর করে ভারত-ভুক্তি করার জন্য। এমনকী ঐসমস্ত জায়গা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত হলেও। কারণ তারা এবং ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট অনেকে ধারনা করে যে, ১৯৮২ সালের আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুসারে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ বা এরিয়া অধিকারে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। কিন্তু দৃশ্যত ভারত

সরকারকে ঐসব কিছু করতে হয়নি। বরং ধৈর্য সহকারে গত তিন সাড়ে তিন দশকের বাংলাদেশের সমস্ত ক্ষমতাসীনদের ব্যবহার করে ভারত আজ বাগিয়ে নিয়েছে ঐদক্ষিণ তালপট্টি এরিয়া, যা কোনভাবে ভারতের অংশ ছিল না। কিন্তু মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে যেসমূহ পরাজয় হয়েছে তা স্বীকার করে যদি বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হতো তা হলে আজ ভারতের বিরুদ্ধে সমুদ্র-সীমা নির্ধারণে এমন কঠিন পরাজয় বরণ করতে হতো না। আসল উভয় ক্ষেত্রেই পরাজয়গুলো ইচ্ছাকৃত এবং ষড়যন্ত্রমুলক। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজয় দাবী করে উল্লাস করা হয়েছে যাতে এদেশের মানুষকে বোকা বানানো যায়। সেই ১৯৯৬ সালে দিল্লীতে পানি ভাগাভাগি চুক্তির পর ঢাকায় যেমন উল্লাস করা হয়েছিলো ঠিক তেমনি। অথচ ঐ পানি ভাগাভাগির চুক্তি দ্বারা সমস্ত অভিন্ন নদীতে তৈরি হয়ে যাওয়া বাঁধগুলোর এবং ভবিষ্যতে আরও বাঁধ তৈরি করার লিখিত এবং অলিখিত ক্ষমতা ভারতকে প্রধান করা হয়। ভারত বাঁধ দেবে আর এদেশে ভারতের তাবেদার সরকাররা ভারতের সাথে কথিত পানি ভাগাভাগির চুক্তি করে ফুর্তি করবে। আর একারণেই ফারাক্কা তৈরির জন্য যেমন ভারত দায়ী তেমনি ফারাক্কাকে ভারতের ইচ্ছেমত চলতে দেওয়ার জন্য মুজিব-জিয়া-এরশাদ-খালেদা-হাসিনা দায়ী। সেসাথে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর কয়েক বছর ধরে দেওয়া "সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দেশের কারো কিছু জানা নেই বা জ্ঞান নেই"। এজাতীয় বক্তব্য আসলে যেকত ভয়াবহ এবং কত হতাশাজনক একটি স্বাধীন দেশের নিরাপত্তার জন্য। এউপলব্ধি জ্ঞান যাদের নেই তারা কেন আসেন সরকার প্রধান হতে, রাষ্ট্রপ্রধান হতে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে। ধরেই নিচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী সমুদ্র আইন বা সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে "এদেশের কারো কিছু জানা নেই, জ্ঞান নেই"। তাহলে গত চল্লিশ বছরে আমাদের নৌবাহিনী কী করলো সমুদ্রে? কী করলো আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের দেশের সার্বিক নিরাপত্তায়? কিসের কমতি ছিল? সমুদ্র আদালতে আমাদের ন্যায্য দাবী নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের জন্য মারাত্মক মরনাস্ত্র থাকা না থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। দরকার ছিল একটু কমনসেন্সের, দরকার ছিল দেশপ্রেমের, দরকার ছিল দেশের প্রতি-দেশের নিরাপত্তার প্রতি শপথের দৃঢ়তার। সরকারের দাবী অনুযায়ী নৌবাহিনীর সবচেয়ে জ্ঞানী এবং চৌকস অফিসারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো এবং বিদেশ থেকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিলো আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে বাংলাদেশের পক্ষে সমুদ্র দাবীর বিষয়টি তত্বাবাধনের জন্য। কিন্তু সমস্ত বিষয়গুলো সে যেভাবে হ্যান্ডেলিং করেছে তাতে অনেক প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। একমনসেন্সহীন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় সবচেয়ে জ্ঞানী ও চৌকশ অফিসার তাহলে অন্যান্যদের অবস্থা কী? আর কীভাবে চলছে এদেশের নিরাপত্তা। দৃশ্যত বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে হাড়িভাংগা নদীর স্রোতধারার সঠিক হিসেব এবং মোহনার সঠিক হিসেব উপস্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ সরকারের একথা ভালো করে জানা আছে যে, হাড়িভাংগা নদী সহ অনেক নদীগুলোর স্রোতধারা ভারত নিয়ন্ত্রণ করে ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে। অথচ এই স্রোতধারার সঠিক হিসেবগুলো আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে উপস্থাপনের উপরেই বাংলাদেশ ভারতের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বা চিহ্নিতকরণ বহুলাংশে নির্ভর করে।

* সমুদ্র আদালতে ভারত-বাংলাদেশ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ

১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন প্রণয়নের পর পরই বাংলাদেশের উচিত ছিল তা অনতিবিলম্বে ভাল করে বিশ্লেষণ করে রেটিফাই করা। এবং আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া। কারণ বাস্তবিকভাবে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সুনির্ধারণের সবচেয়ে মোক্ষম সময় ছিল ১৯৯০ সালের আগে এবং কতকটি ১৯৯৬ সালের আগে। আর সবচেয়ে নাজুক সময় দাঁড়িয়ে যায় ২০০১ সালের পর থেকে। ক্লোল্ড ওয়্যার পরবর্তী এবং সেপ্টেম্বর এলিভেন ২০০১ পরবর্তী বিশ্ব-রাজনীতির পোলারাইজেসানের কারণে। তারপরেও এনাজুক সময়ে নিজেদের অনুকূলে সমুদ্রসীমা সুনির্ধারণের জন্য যেদেশপ্রেম, যেদূরদৃষ্টি এবং যেদৃঢ়তার দরকার ছিল তা দৃশ্যত এদেশের এপর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় আসা এবং শাসন ক্ষমতার বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা বেসামরিক এবং সামরিক ব্যক্তিবর্গের নেই। যেমনটি ছিল না ১৯৯০ বা ১৯৯৫-এর আগে কিংবা তারও আগে স্বাধীনতার পর থেকে। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ তালপট্টি সমুদ্র অঞ্চল তালপট্টি দ্বীপ সহযোগে আজ ভারতের পুরোপুরি দখলে চলে গিয়েছে। একই কারণে অদূর ভবিষ্যতে আরও একটি জটিল অবস্থা তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে যাতে বাংলাদেশ আরও বেশি সমুদ্র অঞ্চল হারাবে ভারতের কাছে। এমনকী আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের দেয়া বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বর্তমানের রায় বহাল থাকা সত্ত্বেও। এউল্লেখিত সমুদ্র অঞ্চল হারানোর সম্ভাবনা ছাড়াও অন্য যেবিষয়টি আজ বাস্তবিকভাবে অনুধাবন যোগ্য তাহচ্ছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে পৃথকভাবে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত উভয় দেশের দাবীগুলোর মধ্যে খুব একটি পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। তা একারণে যে, বাংলাদেশের দাবী অনুযায়ী কিংবা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের রায়ে নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত সমুদ্র অঞ্চল ব্যবহার করার মত রাজনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক ইচ্ছা, শক্তি এবং দক্ষতা মনে হচ্ছে বাংলাদেশের একদম নেই। ভবিষ্যতে আর কোনদিন হবে বলেও সম্ভাবনা নেই। বিশেষকরে যতদিন এদেশের শাসন ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বজ্ঞানহীন হীনপ্রকৃতির রাজনৈতিক, সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব বহাল থাকবে। ফলে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে উপস্থাপিত "ভারতের দাবী" অনুযায়ী তীর থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে যাওয়া দক্ষিণমুখি ভার্টিক্যাল লাইনটি বাস্তবিকভাবে হয়ে যাবে দুদেশের মধ্যকার একপ্রকার ডিফেকটো সমুদ্র-সীমা। অর্থাত হাড়িভাঙ্গা নদীর কথিত বেস পয়েন্ট থেকে গভীর সমুদ্রসীমা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের রায়ে নির্ধারিত সীমারেখাটির অদূর ভবিষ্যতে কোন একসময় অন্তত আরও দশ/বিশ ডিগ্রি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হেলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের রায়ে বাংলাদেশ গভীর সমুদ্রে "বিয়োন্ড টু হান্ড্রেড মাইল আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" নামে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ যেঅংশটির ভাগ পেয়েছে বলে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার অতিমাত্রায় উল্লাসিত হয়েছে, তার অবস্থান পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে সংকোচিত হয়ে একটি হাস্যকর অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে। তবে বাংলাদেশ সরকার যদি বাংলাদেশের নিজস্ব জায়গা "দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ" নিজেদের অধিকারে রাখতে পারতো তাহলে "ইন দ্য ভ্যাসিনিটি অফ সাউথ তালপট্টি আইল্যাণ্ড" সহযোগে যেসমুদ্রসীমা আন্তর্জাতিক সমুদ্র

আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত হত তারমধ্যে টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এরিয়া এবং টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এরিয়া থেকে আরও গভীর সমুদ্র অঞ্চল পর্যন্ত বাংলাদেশের একশত ভাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে "দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ" অবশ্যই একটি শক্ত ঢাল হিসাবে অবস্থান নিত। সেক্ষেত্রে কন্টিনেন্টাল সেলফ এবং আউটার কন্টিনেন্টাল সেলফ ইত্যাদির উপর বাংলাদেশের যথেষ্ট সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবশ্যই এর একটি বিশেষ সুবিধা পেয়ে যেত স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু যেহেতু দক্ষিণ তালপট্টি ভারতকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের মাধ্যমে আইনগতভাবে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অবস্থানগত সমস্ত সুবিধা ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে আইনগত প্রাপ্যের চাইতেও অনেক বেশি ভোগ করবে ভারত। বাস্তবে ভারতের "ভবিষ্যতের এভোগ করা সুবিধাটি" এক সময় বাংলাদেশের জন্য খুব যন্ত্রণাকর হয়ে দাঁড়াবে বিভিন্ন কারণে। সেকারণে সবচেয়ে রহস্যজনক বিষয় হচ্ছে যে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকার "দক্ষিণ তালপট্টি অঞ্চল এবং দ্বীপ" নিজেদের বলে দাবী করার ক্ষেত্রে বা নিজেদের অধিকারে রাখার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে কোন জোরালো ভূমিকা রাখেনি বা কোন জোরালো অবস্থান নেয়নি। বরং দৃশ্যত বাংলাদেশ সরকারের অতি মনোযোগ ছিল "বিয়োন্ড টু হানড্রেড মাইলস আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" সমুদ্র এরিয়া ব্যবহারের অধিকার অর্জনের দিকে। এক্ষেত্রে এঅতি মনোযোগ একটি চরম স্ট্রাটেজিক ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে আবার অন্যকিছু হতে পারে।তবে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে উপস্থাপিত বাংলাদেশ এবং ভারতের যুক্তিগুলোসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ"অন্যকিছু" বিষয়টি খুব বেশি অনুভূত হয়। "বিয়োন্ড টু হানড্রেড মাইলস আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" সমুদ্রসীমা ব্যবহারের দাবী এবং অধিকার যেমন বাংলাদেশের তেমনি বাংলাদেশের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে আসা অন্য দু স্টেক হোল্ডার মিয়ানমার এবং ভারতেরও। এক দেশের "বিয়োন্ড টু হানড্রেড মাইলস আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" ব্যবহারের সুবিধা অন্য স্টেক হোল্ডারদের প্রাপ্য ২০০ মাইল পর্যন্ত সীমার সমুদ্র অঞ্চলের মধ্যে থেকে দেওয়া হয় না কখনও। বরং অনেকক্ষেত্রে সব স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে ২০০ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রসীমা ভাগ করে দেওয়ার পর বাইরের দিকের অবশিষ্ট কিছু অংশে "বিয়োন্ড টু হানড্রেড মাইলস আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" ব্যবহারের জন্য ভাগাভাগি হয়। বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং ভারতকে ২০০ মাইল সমুদ্রসীমা ভাগ করে দেওয়ার পর আউটার সমুদ্রে যেঅমীমাংসিত প্যাসেজ থেকে যায় সেখান থেকে "২০০ মাইল পর্যন্ত সমুদ্র অঞ্চল" প্রাপ্যতা অনুযায়ী "বিয়োন্ড টু হানড্রেড মাইলস আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" ভাগ করে নেওয়া বা দেওয়ার বিষয়টি আদালতের বিবেচনায় আসে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল মিয়ানমার এবং ভারতের বিরুদ্ধে সমুদ্র আদালতে যাওয়ার সময় "আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতকে" একটি বিশেষ রিকোয়েস্ট করা। যাতে মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের মাধ্যমে পৃথকভাবে ২০০ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পরই একটি "তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের" মাধ্যমে একসাথে তিন দেশের "বিয়োন্ড টু হানড্রেড মাইলস আউটার কন্টিনেন্টাল শেলফ" ব্যবহারের বা অধিকারের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হোক। সেঅনুযায়ী আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালত যদি সিদ্ধান্ত নিত তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাতে বিশাল

Thank You for previewing this eBook

You can read the full version of this eBook in different formats:

- HTML (Free /Available to everyone)
- PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
- Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)

To download this full book, simply select the format you desire below